Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XV, Issue-I, October 2026, Page No. 42-51
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.15.issue.01W.134

মধ্যযুগের নির্বাচিত মঙ্গলকাব্যে শৃঙ্গার ভাবনা: একটি আলংকারিক বিশ্লেষণ

অনিন্দিতা সাহা, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 29.10.2026; Accepted: 31.10.2026; Available online: 31.10.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Although the medieval period of Bengali literature is widely recognized as the age of Mangal-Kavya, these literary works vividly portray not only the worship and glorification of deities but also the contemporary socio-economic, political, and religious conditions of society. Alongside these broader contests, the poets meticulously depicted domestic life and conjugal relationships, presenting the emotional experiences and intimate aspects of Bengali households. Although the primary purpose of these narratives was to establish the glory of various deities, the poets frequently employed Sringara Rasa, or the aesthetic sentiment of love, to enrich their narratives and enhance their literary appeal. Futhermore, since the concept of Sringaraoriginates in the Indian tradition of poetics, its analysis requires engagement with the theoretical principles of Sanskrit Alankarasastra. In this context, while Bharatchandra Ray's poetry demonstrates a refined expression of Sringara Rasa, its varied manifestations are also evident in Vijay Gupta's 'Manasa Mangal', Mukunda Chakraborty's 'Chandi Mangal', and Ghanaram Chakraborty's 'Dharma Mangal'. The primary objective of this paper is to analyse the expression and aesthetic significance of Sringara Bhavana in this selected Mangal-Kavyas through the theoretical framework of Indian poetics.

Keywords: Mangalkavya, sringar rasa, prem, kavi, vabna, dampatya.

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য জগতে বৈষ্ণব সাহিত্যের রাজত্ব থাকলেও একাধিপত্য ছিল, তা বললে ভুল হবে। কারণ মঙ্গলকাব্য, রাজসভার সাহিত্য তথা মুলসিম সাহিত্য এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র মতো কালবিজয়ী সাহিত্যরাজিও মধ্যযুগেরই সৃষ্টি। তাছাড়া এই প্রত্যেকটি কাব্যসাহিত্যই নবরসের বিচারে আপন আপন মহিমায় মহিমান্বিত। কোন জায়গায় দেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে মঙ্গলগাথা রচিত হয়েছে, কোথাও মানব-মানবীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে একটি দেহসাধনার ধারা যা ধর্মীয় গুহ্যতত্ত্ব আলোআঁধারি ভাবে বর্ণীত হয়েছে, সেই মূল কাব্যের অনুবাদ হয়েছে, আবার 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-য় নির্জলা প্রেমের বিভিন্ন পালার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাই মধ্যযুগের কাব্যগুলির শৃঙ্গার-রস আলোচনা করতে গেলে আমাদের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাজন করে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু প্রবন্ধের আলোচ্য মঙ্গল সাহিত্যের শৃঙ্গার রস বিবেচনা করতে গেলেও আমাদের প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র তথা আলংকারিকদের দ্বারস্থ হতেই হবে কারণ সেখনেই লুকায়িত রয়েছে শৃঙ্গার ভাবনার আসল তত্ত্ব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে বৈষ্ণব সাহিত্য ব্যতীত সাহিত্যের মধ্যে আমরা প্রেম তথা শৃঙ্গার-রস খুবই সীমিত পরিমাপে দেখে থাকি। কারণ মঙ্গলকাব্য রচনার

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বর্গের দেবী-দেবতার মর্ত্যলোকে পূজা প্রচার। অতঃপর, সাহিত্য যেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের নিমিত্তে রচিত হয়ে থাকে সেখানে বিশুদ্ধ শৃঙ্গার-রস খুঁজে পাওয়াটা অনেকটাই বিরল। তবুও 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী' দেবীর মহিমাকথার প্রচারের মধ্যে দিয়েও শৃঙ্গারের যে সামান্য ছিটেফোঁটা আমরা মঙ্গলকাব্যে দেখতে পাই তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা যদি চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে মঙ্গলসাহিত্যের কাল নির্ণয় করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে চৈতন্য পূর্ববর্তী কালে আমরা শুধুমাত্র মনসামঙ্গল কাব্য পেয়ে থাকি। চৈতন্য জীবনীকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁর 'চৈতন্য ভাগবত' কাব্যে সুস্পষ্ট ভাবে ততকালীন সমাজচিত্র উত্থিত করে বলেছেন যে-

"ধর্ম কর্ম লোকে সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দম্ভ করি' বিষহরী পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন।।"[১]

অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের গীত বঙ্গভূমিতে বহুকাল ধরেই প্রচলিত রয়েছে। তাই চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী সময়ের মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে শৃঙ্গার-রসের ব্যবহার আমরা এখানে বিশ্লেষণ করবো। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যানুজায়ী পুঁথিটি রচিত হয় ১৪১৬ শকাব্দ তথা ১৪৯৪-৯৫ সালের মধ্যে। উক্ত কাব্যে শৃঙ্গার-রসের ব্যবহার কবি তখনই দেখিয়েছেন যখন স্বর্গের অভিশপ্ত দেব-দেবীদের মর্ত্যে জন্মগ্রহণ দেখাতে হয়েছে। অর্থাৎ তা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যে সম্ভোগের চিত্র মাত্র। তাছাড়া 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় যে দেবী মনসার জন্ম বৃত্তান্তের বর্ণনা করতে গিয়েও কবি সাধারণ উদ্দীপন বিভাবের অনুকূল পরিবেশে শিবের কামুক চরিত্রের অঙ্কন করেছেন। যথা–

"কামে ব্যাকুল শিব কামে চঞ্চল জীব
রতি রসে করে টসমস।
অতিকামে হইয়া ভোল শ্রীফলবৃক্ষেরে দিল কোল
আচম্বিতে খসিল মহারস।।"[২]

এখানে পাঠকমাত্রই বুঝতে পারছেন যে শিবের এই কামুকতার ছবি শুধুমাত্র দেবীর জন্মের উদ্দেশ্যেই, অন্যথা এখানে শৃঙ্গার-রসের কোন গুণই নেই। আবার দেবী মনসার রূপজ মোহে ভেসে গিয়েও শিব কামানলে দগ্ধ হয়েছে –

"কন্যার রূপ যৌবন অদ্ভুত হেন বাসি।
করিব গন্ধর্ব বিয়া লইয়া যাব কাশী।।
কামভাবে মহাদেব বলে অনুচিত।
লজ্জায় বিকল পদ্মা শুনিতে কুৎসিত।।"[৩]

ডোমিনীর রূপ দেখেও শিবের কামে মোহিত হয়ে নিজের স্বরূপ ভুলে গেছেন –

"ভালমন্দ জ্ঞান নাই বুদ্ধি হল ক্ষে।
সদা বলে ডোমিনী মোরে আলিঙ্গন দে।।"[৪]

কাব্যে শিবের কামভাব শুধুমাত্র দেবী মনসা ও ডোমিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়নি। কারণ মৃত পতির প্রাণোদ্ধারের নিমিত্ত বেহুলা স্বর্গে যাওয়ার পরেও তাঁর নৃত্যগীত ও নয়ন কটাক্ষে শিবের অন্তরে দারুণ কামের সঞ্চার হয়–

"নানাগতি করে বেহুলা কটাক্ষ সন্ধান।
কামে মোহিত হইল মহাদেবের প্রাণ।।"[৫]

কাব্যের এই অংশগুলি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে শিবের চরিত্রের সম্ভোগের প্রতি যে লালসা তা একান্তই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কামনা, এখানে প্রেমের বৈচিত্র্য খোঁজা পণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ সমালোচকের মতে –

> "Kama' is mind's carnal desire; wherwas prema is not. Kama's nature is to roam from one thing to another for the satisfaction of its cravings; prema is undeviating and true to one. Both are seekers of ananda. But kama hunts for pleasure, taking the aid of mundane things;"[৬]

এই একই ধরনের নীরস কামপ্রবাহ কাব্যটিতে স্থান বিশেষ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে, যেমন পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে দেবী মনসা শঙ্কু ওঝাকে ছলনা করতে সময়ও কাম ভাবকেই মূলত প্রাধান্য দিয়েছেন, যথা –

"কামদৃষ্টে চাহিয়া জয় বিষহরী।
পঞ্চবাণ ছাড়ে কাম সুসন্ধান করি।।
শঙ্কুরে বলে কমলা মোর প্রানধর।
আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর।।
শৃঙ্গার আশায় ওঝা হাত দিল গায়।
ক্রোধ করি কমলা সরিয়া দূরে যায়।।"[৭]

অথবা চাঁদ সদাগরকে ভুলিয়ে মহাজ্ঞান হরণ করতে সময় দেবী নটীর বেশ ধারণপূর্বক সম্ভোগের মোহে চাঁদকে লালায়িত করে তুলেন –

মনসা নয়ন-কোণে সঘনে কটাক্ষ হানে
শেল সম বাজে চান্দর বুকে।
দেখিয়া নটীর বেশ কামে তনু হল শেষ
আড় আঁখি চাহে সদাগর।।"[৮]

এখানে শৃঙ্গারের আমেজ থাকলেও শুধুমাত্র তা প্রয়োজনের খাতিরে সম্ভোগের ছবি মাত্র। কারণ বিপ্রলম্ভ ছাড়া সম্ভোগ পরিপুষ্টি লাভ করতে পারেনা। তাই এখানে যে শৃঙ্গার-রসের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই তা সহৃদয় পাঠক মাত্রই অনুধাবন করতে পারেন। পুনরায় স্বর্গভ্রষ্ট অভিশপ্ত অনিরুদ্ধকে পূজা প্রচারের নিমিত্তে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করার সময়ও কবি স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যের সম্ভোগ চিত্র এঁকেছেন। যেমন –

"সোনেকার রূপ বেশ শোভা করে অতি।
মদন রাজারে যেন দেখা দিল রতি।।
মদন মোহিত হইয়া চান্দ সদাগর।
হাতে ধরি তুলি নিল খাটের উপর।
প্রিয়া তোরে দেখিয়া প্রাণ নহে স্থির।
কামবাণে দহিতেছে আমার শরীর।।"[৯]

এই একই দৃশ্য চৈতন্য পরবর্তী যুগের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও পরিলক্ষিত হয়। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্য রচনা করেন ১৫১৫ শকাব্দ তথা ১৫৯৩-৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। সম্পূর্ণ কাব্য রচনায় কবি যথাসম্ভব যুগানুযায়ী আধুনিকতা দেখানোর চেষ্টা করলেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম 'আখেটিক খণ্ড'-এ শৃঙ্গার রসের যথাযথ ব্যবহার করেননি। উপরন্তু কবি দেবীর পূজা প্রচারের উদ্দ্যেশে স্বর্গভ্রষ্ট নীলাম্বর ও ছায়াবতীর জন্মপালা রচনার প্রয়োজনে শৃঙ্গারের

শুধুমাত্র সম্ভোগ চিত্রের খানিকটা ছবি এঁকেছেন। তবে এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে 'সাহিত্য দর্পণ'-কার বিবাহিতা স্ত্রীর সম্ভোগকে শৃঙ্গার রস হিসেবে আখ্যা দিতে নারাজ। তাঁর মতে –

"শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে।।
পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বা তু বেশ্যাং চাননুরাগিনীম।
আলম্বনং নায়িকাঃ সুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ।।"[১০]

অর্থাৎ কামের আবির্ভাবকে 'শৃঙ্গ' হয়। কামের আবির্ভাবের মূল রস উত্তম প্রক্রিতির হয়ে থাকে। বিবাহিতা এবং অনুরাগহীন বেশ্যা এই শৃঙ্গার রসের অনুগত নয়। উপরন্তু দক্ষিনাদি নায়ক নায়িকাবৃন্দ এই রসের আলম্বন বিভাব। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য চৈতন্য পরবর্তী যুগের রচনা। তাই সেখানে বৈষ্ণব আলংকারিকদের মতানুজায়ী পরোঢ়াও যেহেতু নায়িকা ভেদ প্রকরণ অনুযায়ী ৩৬০ প্রকার নায়িকার অন্তর্গত, অতএব বিবাহিতা নায়িকার শৃঙ্গার রস অবশ্যই যথাযথ। তাই বলা যেতে পারে, সেই কারণেই 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দাম্পত্যের সম্ভোগচিত্র কবি অনেকটাই বিশ্লেষণাত্মক ভাবে দেখিয়েছেন। তবে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখেটিক খণ্ডে কবি খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে শৃঙ্গার রসের বর্ণনা করেছেন, যেমন –

"সেইদিন ধর্মকেতু রতি-রঙ্গ মনে।
আনন্দে ভুঞ্জিল রতি নিদয়ার সনে।।"[১১]

অপরদিকে আখেটিক খণ্ডের মূল নায়ক নায়িকা কালকেতু ও ফুল্লরার দাম্পত্যে কবি কোন রকমের শৃঙ্গার বর্ণনা করেননি। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে দারিদ্রের কষাঘাতে রতি রসের আমোদ দুঃখ-সমুদ্রে ভেসে গেছে। কিন্তু 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের বণিক খণ্ডে ধনপতি সওদাগর ও খুল্লনার প্রথম পরিচয়ের সময় খানিকটা শৃঙ্গার-রসের দেখা মেলে। যথা –

"ধনি সুন্দরি তোহে নিবেদন করি।
পারাবত লৈয়া মোর প্রাণ কৈলে চুরি।।"[১২]

এখানে উভয়ের কথোপকথনে অনেকটা দর্শনজাত পূর্বরাগ প্রকাশ পেয়েছে, কারণ ধনপতি খুল্লনার রূপমুগ্ধ ছিলেন। এর পরেই শ্রবণজাত পূর্বরাগের আভাস দিয়ে কবি দেখিয়েছেন যে খুল্লনার কথা লোকমুখে শ্রবণ করে ধনপতির মনে পুনঃ কাম ভাব জাগরিত হয়েছে –

"লোকমুখে শুনে সাধু খুল্লনার কথা।
সাধুর হৃদয়ে লাগে কামশর বেথা।।"[১৩]

কারণ ভরতমুনি তাঁর 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে দর্শন, শ্রবণ, সুমধুর বার্তালাপের মাধ্যমে কামের সঞ্চার হয়ে থাকে –

'শ্রবণাদ্দর্শনাদ্রূপদঙ্গলীলাবিচেষ্টিতৈঃ।
মধুরৈঃ সম্প্রলাপৈশ্চ কামঃ সমুপজায়তে।।"[১৪]

ধনপতির হৃদয়ের পূর্বরাগও দেহজ কামগন্ধী। এখানে পূর্বরাগের লাজুকতা নেই, উপরন্তু আছে সুন্দরী নারীদেহ ভোগ করার প্রবল বাসনা। শৃঙ্গার রস এখানে দেহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে, তা দেহাতীত হয়ে উঠতে পারেনি।

আবার প্রসঙ্গক্রমে মুকুন্দ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন যে শৃঙ্গার রসের বিবেচনায় ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনা পরোঢ়া নায়িকা হলেও স্বামী ঘরে সতীনের আগমন ঘটাবে জেনে চরম আপত্তিতে ফেটে পরেছেন। সেখানে লহনার মানই শৃঙ্গার রসের ধারক। যেমন–

"লহনা লহনা বলি দাকে সদাগর।
অভিমানে সাধে রামা না দেই উত্তর।।"[১৫]

কিন্তু এর পরেই লহনার মান ভাঙাতে গিয়ে ধনপতি কামাতুর হয়ে আদিরসে মজে যান এবং কামবাণে বিদ্ধ করে লহনার মানেরও অবসান ঘটে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যিকেরা তাঁদের কাব্যে যতটা রোমাঞ্চকর ভাবে, ধৈর্য সহকারে নায়ক কত্রিক নায়িকার মান ভঞ্জন দেখিয়েছেন, অথবা মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদকর্তারা যেই মমত্ব দিয়ে রাধাকৃষ্ণের মান ও অভিমান সাঙ্গ পালার নিখুঁত চিত্র অংকন করেছেন সেই সুনিপুণ কারুকার্য মঙ্গলকাব্যে অনুপস্থিত। যেমন –

"রামা অভিমানী শেষ নিশিথিনি
কামবাণে সাধু অন্ধ।
লহনা নিদয় পাইআ সময়য়
সাধু করে বাহুবন্ধ।।
সাধু হাতে ধরে লহনা নিবারে
চঞ্চল কঙ্কণপানি।
উদিত কামান মধ্যে পঞ্চবাণ
কন্দল ভাঙ্গে আপুনি।।"[১৬]

এখানেই মঙ্গলকাব্যের সীমাবদ্ধতা পরিমাপ করা যায়। অপরদিকে ধনপতির কাছ সম্ভোগ সুখ লাভের কারণেও লহনা খুল্লনা উভয় নারীর মধ্যে বাকবিতণ্ডার বিবরণ কাব্যে দেখতে পাওয়া যায়, এবং সেখানে নারী কামাতুরা হয়ে স্বামীসঙ্গ লাভে উন্মত্তা প্রায়। যেমন খুল্লনার প্রতি লহনার উক্তি –

"তুহু বালা খিনবলা নাহি জান রতিকলা
না জাইহ প্রভুর নিকটে।
রাহুর ভোখের বেলা জেন নব শশিকলা
পড়িবে বিষম সঙ্কটে।।"[১৭]

প্রত্যুত্তরে খুল্লনা বলেন,-

"শুনগো লহনা দিদি প্রাণের বহিনি।
রমণী রমণে মরে কোথাহ না শুনি।।"[১৮]

এখান উভয় পরোঢ়া নারীর স্বামী প্রেমের চাইতে দেহসুখ ভোগের বাসনাই প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রেম এখানে গৌণ, যৌন বাসনাই মুখ্য। রূপের মোহে নারী এখানে পুরুষকে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন, তাই প্রেম এখানে দানা বেঁধে ওঠেনি।

কালানুক্রমিক ভাবে দেখতে গেলে চৈতন্য পরবর্তী যুগের অপর একটি উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্য হল 'ধর্মমঙ্গল কাব্য'। এই কাব্য রচনায় একাধিক কবি মনোনিবেশ করলেও কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত। কবির কাব্য সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে খ্যাতি লাভ করেছিল। মধ্যযুগের অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো 'ধর্মমঙ্গল কাব্য'-ও শৃঙ্গার রস বিচারে অনেকটাই অপরিপক্ক। তবে এখানেও কবি কাব্যের প্রয়োজনে একটু-আধটু শৃঙ্গার রস সৃষ্টি করেছেন। যেমন, লাউসেনের জন্ম দেখানোর জন্য কবিকে রঞ্জাবতীর স্বামীর সঙ্গে সম্ভোগের বর্ণনা কবি করেছেন –

"সহযোগে বসন্ত সুন্দরী বসে বামে।
যুবক জিনিয়া রাজা জর জর কামে।।

. . .

প্রকাশে বদন বিধু ঘুচায়ে বসন।
পুন পুন পিয়ে মধু মাতিলা মদন।।"[১৯]

আবার গোলাহাটে লাউসেনের রূপমুগ্ধা ভাজন বুড়ীর কাম বর্ণনা করে কবি বলেছেন যে, -

"এস নাতি এক রাতি রতি রসে থাকি।
সেন বলে দূর বুড়ী অধম নারকী।।"[২০]

এখানে সম্ভোগের ইঙ্গিত একেবারে হীন শ্রেণীর। অপরদিকে লাউসেনের রূপ ও চরিত্রের বর্ণনা শুনে সুরিক্ষার শৃঙ্গার ভাবনা কবি খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুরিক্ষার শ্রবণজাত পূর্বরাগের বিবরণী দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন –

"সুনাগর সংবাদ শুনিয়া শশিমুখী।
দাসীরে পাঠায়ে দিল পরম কৌতুকী।।"[২১]

তবে সুরিক্ষা যেহেতু বেশ্যা ছিলেন অতএব সেখানে লাউসেনের প্রতি তাঁর দেহজ কামনাটাই প্রবল ছিল, যেমন–

"ঠাকুরালী করিয়া থাকহ দিন দশ।
রতিরঙ্গ সন্ধান শিখাব পাঁচ রস।।"[২২]

এখানে সুরিক্ষার শৃঙ্গার তথা পূর্বরাগকে সাধারণী বলা চলে। আলংকারিকের মতে –

"সাধারণরতিপ্রায়ঃ সাধারণ ইতীরিতঃ।।"[২৩]

অর্থাৎ সাধারণী রতি একেবারেই সাধারণ। কারণ যেখানে নায়িকার শুধুমাত্র নায়কের রূপমুগ্ধ এবং সেই রূপের প্রেমে প্রবল সম্ভোগেচ্ছায় নায়িকা মেতে ওঠে সেখানে সাধারণী পূর্বরাগ জন্মায়। সেখানে প্রেমের মাধুর্যের চাইতে আদিরসাত্মক সম্ভোগের কামনাই বেশি থাকে।

মধ্যযুগের সর্বশেষ মঙ্গলকাব্য হচ্ছে কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'। কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাঁড়িয়ে এই কাব্য রচনা করেন। দেবী অন্নপূর্ণার গুণমহিমা প্রচারকারী এই কাব্যের প্রথম খণ্ডে শৃঙ্গার রস একদমই সীমিত পরিমাণে রয়েছে। বসুন্ধরের অভিশাপ পালা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি সেখানে রতিরসের বর্ণনা করেছেন। বসুন্ধরকে অভিশাপ দেওয়ার ক্ষুদ্র স্বার্থে সেখানে শৃঙ্গার রসে আনয়ন করতে হয়েছে, -

"আলিঙ্গন দিয়া কান্ত কামানল কর শান্ত
মোরে আর বিলম্ব না সহে।"[২৪]

ঠিক একই সম্ভোগ মর্ত্যলোকে বসুন্ধরের জন্ম দেখাতেও কবি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। যেমন, -

"স্নানদিনে সেই ফুল বাটিয়া খাইল।
পতিসঙ্গে রতিরঙ্গে গর্ভিণী হইল।।"[২৫]

'অন্নদামঙ্গল কাব্য'-এর প্রথম খণ্ডে মধ্যযুগের অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো গতানুগতিক শৃঙ্গার রসের আভাস থাকলেও উক্ত কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড তথা 'বিদ্যাসুন্দর পালা' পাঠ করলে পাঠক মাত্রেরই মনে হবে যেন কবি শৃঙ্গার রস বিশ্লেষণাত্মক ভাবে বর্ণনা করার জন্যই কাব্যটি রচনা করেছেন। কাব্যের উপজীব্য বিষয় হল বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্তপ্রেম। কাব্যের সূচনা পর্ব থেকেই কবি শৃঙ্গার রসের বিস্তার করতে শুরু করেছেন। ভাটের বাচনিক রাজকুমারী বিদ্যার রূপ ও গুণের বর্ণনা শুনে সুন্দর প্রেমাসক্ত হয়ে পরেন। তাই যেহেতু বিদ্যার রূপবর্ননা শ্রবণ মাত্রই সুন্দরের মনের পূর্বরাগ জাগরিত হল, তাই এই প্রেম মূলত রূপজমোহ তাড়িত শ্রবণজাত পূর্বরাগ, যথা–

"ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখপারাবার।।
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ।।"[২৬]

অপরদিকে বিদ্যাকে লাভ করার আশাকে কবি বাকচাতুর্যে অপূর্বভাবে উদ্দীপন বিভাবের সহায়তায় সুন্দরের মনের রতি রসের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন –

"পুষ্পবনে পক্ষীগণে নিশি দিশি জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে।।
. . .
দেখি সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস।।"[২৭]

তাছাড়া কাহিনীক্রমে সুন্দরের বলিষ্ঠ রূপমাধুরী দেখে রাজ্যের সুন্দরীগণের যে কামোন্মত্ত দশা কবি আলোচ্য কাব্যে দেখিয়েছেন, তা আদিরসাত্মক কামেরই পরিচায়ক। সেখানে প্রেমের মাধুর্য অনুপস্থিত, দেহজ ভোগ বাসনাই প্রবল। তাই ভারতচন্দ্র লিখছেন –

"দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জরজর যত রমণী।
কবরী ভূষণ কাঁচুলি কষন
কটির বসন খসে অমনি।।"[২৮]

এই বর্ণনায় প্রেমের লেশমাত্র অনুপস্থিত। অপরদিকে সুন্দর কতৃক প্রদত্ত শ্লোক পাঠপূর্বক বিদ্যার হৃদয়ে যে শৃঙ্গার রসের হিল্লোল আন্দোলিত হয় তা বিদ্যার মনে শিহরন তোলে, এবং সহৃদয় পাঠক মাত্রই অনুমান করতে পারেন যে বিদ্যার এরূপ আচরণ তাঁর পূর্বরাগের ঘোষণা করে বলছে যে রতি রসে নায়িকার শরীর ডগমগ করছে। এর পরেই বিদ্যা প্রকাশ্যে মালিনীর কাছে সুন্দরের রূপের বর্ণনা শ্রবণপূর্বক শৃঙ্গার রসে আকুল হয়ে উঠলেন –

"কি বলিলি মালিনী ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল।।"[২৯]

ক্রমে বহু বাধা অতিক্রম পূর্বক বিদ্যাসুন্দরের যখন সম্ভোগের ছবি কবি অংকন করতে নিমগ্ন হয়েছেন তখন প্রেমের ঘনীভূত নির্যাস দেখানোর আশে বিদ্যাসুন্দরের গান্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ করেন, যথা –

"বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার।।"[৩০]

তাই এই রতিকে সমঞ্জসা রতি বলা যেতে পারে। কারণ সমঞ্জসা রতিতে বিবাহ পশ্চাৎ প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গে সম্ভোগ ঘটে থাকে। আলংকারিকের মতে -

"ভবেৎ সমঞ্জসরতিস্বরূপোহইয়ং সমঞ্জস।"[৩১]

আবার সমালোচকের মতে –

"সমঞ্জস রতি সঙ্গমের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া বিভাবাদির মিলনে সমঞ্জসাখ্য পূর্ব্বরাগ রস হয়"।[৩২]

পূর্বরাগের পর কবি কাব্যে দীর্ঘস্থান জুড়ে বিদ্যাসুন্দরের আদিরসাত্মত সম্ভোগের বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা করেন, যেমন –

"আলিঙ্গন প্রেম রসে মাতিল মদন।
কামমদে মাতাল দেখিয়া দুই জনে।।
যন্ত্র তন্ত্র ফেলায়ে পালায় সখীগণে।।"[৩৩]

প্রথমাবস্থায় কবি সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ দিয়ে বর্ণনা শুরু করলেও অবশেষে তা সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে পরিণত হয়। আলংকারিকের মতে –

"দুর্ল্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাবিযুক্তয়োঃ।
ঊপভভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্।।"[৩৪]

অর্থাৎ পরাধীন নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদাত্মক কারণে পরস্পর বিরহ ঘটলে এর পর মিলনকালে সম্ভোগ সুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তাকেই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ বলা হয়ে থাকে। ফলে নায়ক নায়িকার সম্ভোগ ও বিপরীত রতিক্রিয়া ঘটিত হয়। আলোচ্য কাব্যেও আমরা অনুরূপ দৃশ্য দেখতে পাই। ক্ষণিককালের জন্য সুন্দরের বিয়োগ ঘটার পর যে মিলনদৃশ্য সেখানে কবি বিপরীত সম্ভোগ বর্ণনা করেছেন –

"মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে।
সুন্দর পড়িলা প্রেম তরঙ্গে।।"[৩৫]

এভাবেই ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে আলংকারিকদের মতানুযায়ী শৃঙ্গার রসের অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। কবি অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাব্য রচনা করেছেন বলে তাঁর কাব্যে প্রাচীনের পাশাপাশি চৈতন্য পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব আলংকারিকদের প্রভাব অধিক পরিমাণে লক্ষণীয়। যেমন, উক্ত কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে কবি 'ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ' অংশে শৃঙ্গার ক্রিয়া রচনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে বৈষ্ণব আলংকারিকদের পদানুশীলন করেছেন। যথা -

"প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয়ে দুহে ছিলা দুঃখ সয়ে
আমা দেখি বাসসজ্জা হৈলা।
কার ঘরে যাব আগে উৎকণ্ঠিতা এই রাগে
দেহহুড়ীতে অভিসার কৈলা।।"[৩৬]

এখানে কবি অনেক স্বাবাভিক ভাবেই ভবানন্দের দাম্পত্য জীবনের একটি প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে শৃঙ্গার-রস তথা সম্ভোগ চিত্র অংকন করেছেন। কবি তাঁর রচনাচাতুর্যে নায়কের অভিসার এবং নায়িকাদ্বয়ের মধ্যে বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা এবং প্রোষিতভর্ত্তৃকা প্রেমিকার ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন এবং এখানেই শৃঙ্গার-রসের সার্থকতা।

অবশেষে মধ্যযুগের প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলোর আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সর্বত্র দেবদেবীর মহিমা প্রচারের প্রয়োজনেই কাব্যে শৃঙ্গার রসের উৎপত্তি ঘটেছে যদিও, তবুও সেই কাব্যের কবিরা সেখানে যথাযথ ভাবে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের মানদণ্ড অনুযায়ী সার্থক ভাবে বিরহ-মিলনাত্মক শৃঙ্গার পরিবেশনে সাফল্য অর্জন করেছেন। কিন্তু কবি ভারতচন্দ্রের কাব্য রচনার ক্ষেত্রে এই নীতির অনেকটাই ব্যাতিক্রম দেখা যায়। কারণ কবির কাব্য রচনার উদ্দেশ্য মর্তে দেবীর পূজা প্রচার হলেও সেখানে প্রেমের ঘনীভূত দেহজ কামোন্মত্ততাই প্রাধান্য লাভ করেছে যা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের শৃঙ্গারের তুলনায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে নির্ভেজাল ভাবে বিস্তার লাভ করেছে। তাই এই বিশুদ্ধ রতি ভাবনা তথা শৃঙ্গার-রসের ব্যবহারই কবি ভারতচন্দ্রের রচনাকে আলাদা পরিচয় প্রদান করেছে যা মধ্যযুগের নির্বাচিত মঙ্গলকাব্যে আলংকারিক দৃষ্টিকোণ থেকে শৃঙ্গার-রস বিবেচনায় পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ (সম্পা.)। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, সংকীর্তন বিভাগ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৬।

২. গুপ্ত, বিজয়, বিশ্বাস, অচিন্ত (সম্পা.)। মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১১৩

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৪

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৩

৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৭

৬. Bezbaroa, Lakshminath. edited by Dr. Maheswar Neog. The Religion of Love and Devotion, Assam sahitya sabha, Jorhat, assam, first combined edition 1968, page- 27

৭. গুপ্ত, বিজয়, বিশ্বাস, অচিন্ত (সম্পা.)। মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৯, পৃষ্ঠা- ১৮০।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯১।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২০৭।

১০. কবিরাজ, বিশ্বনাথ, মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত (সম্পা.)। সাহিত্যদর্পণঃ, পুস্তক-শ্রী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০, পৃষ্ঠা- ২২০।

১১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। চন্ডীমঙ্গল- আক্ষটি খণ্ড (কালকেতু উপাখ্যান), গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা, দ্বিতীয় বামা সংস্করণ ২০০০, পুনর্মুদ্রণ ২০১০, পৃষ্ঠা- ৫২

১২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা.)। কবিকঙ্কণ- চণ্ডী : ধনপতি উপাখ্যান, বিদ্যা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৬।

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭।

১৪. আচার্য, ভরত। বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। ভরত নাট্যশাস্ত্র (তৃতীয় খণ্ড), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা- ১৫০।

১৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা.)। কবিকঙ্কণ- চণ্ডী : ধনপতি উপাখ্যান, বিদ্যা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১০।

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১।

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৭।

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৮।

১৯. চক্রবর্তী, রূপরাম, কয়াল, অক্ষয়কুমার (সম্পা.)। ধর্মমঙ্গল। ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, চতুর্থ মুদ্রন ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৫২।

২০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৭৩।

২১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৭৩।

২২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৯৯।

২৩. গোস্বামী, শ্রীরূপ। উজ্জ্বলনীলমনিঃ। তারা লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম তারা সং ১৪১৪ সাল, পুনর্মুদ্রণ ১৪২১ সাল, পৃষ্ঠা– ৮৬৪।

২৪. ভারতচন্দ্র, মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু (সম্পা.)। অন্নদামঙ্গল। মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮, পুনর্মুদ্রণ ২০১১-২০১২, পৃষ্ঠা– ১৬১।

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৭।
২৬. বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত (সম্পা.)। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম সং ১৯৪৩, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা- ২০৭-২০৮।
২৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১৭।
২৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১৮।
২৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪১।
৩০. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫৯।
৩১. গোস্বামী, শ্রীল রূপ। উজ্জ্বলনীলমনিঃ। তারা লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম তারা সং ১৪১৪ সাল, পুনর্মুদ্রণ ১৪২১ সাল, পৃষ্ঠা– ৮৬০।
৩২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৬০।
৩৩. বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত (সম্পা.)। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম সং ১৯৪৩, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা- ২৩১।
৩৪. গোস্বামী, শ্রীল রূপ। উজ্জ্বলনীলমনিঃ। তারা লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম তারা সং ১৪১৪ সাল, পুনর্মুদ্রণ ১৪২১ সাল, পৃষ্ঠা– ৯৫০।
৩৫. বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত (সম্পা.)। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম সং ১৯৪৩, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা- ২৭৩।
৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২২।